সত্যের সেনানী

সিরিজ-দুই

সত্যের সেনানী

এ, কে, এম, নাজির আহমদ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৮৪

৪র্থ প্রকাশ
শাবান ১৪৩২
আষাঢ় ১৪১৮
জুলাই ২০১১

বিনিময় ঃ ২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SOTTER SHENANI (Soldier of Trouth) by A. K. M. Nazir Ahmed. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 20.00 Only

শাহ
ওয়ালী উল্লাহ র.

بسم الله الرحمن الرحيم
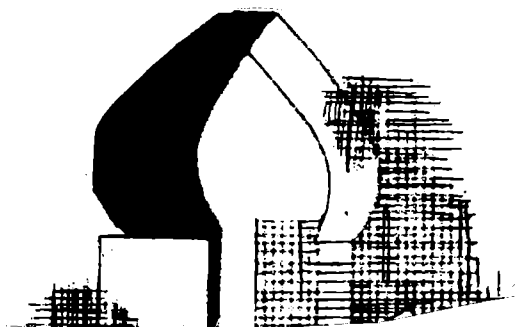
দিল্লীর এক প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন শাহ্ আবদুর রহীম। তাঁর গবেষণার ফল ও চিন্তাধারা বিকাশের মাধ্যম ছিলো মাদরাসা রহীমিয়া। তিনি ছিলেন ইসলামের সেবায় নিবেদিত প্রাণ। হিজরী ১১১৪ সালে তাঁর এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর নাম রাখা হয় শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্র পরিবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রা.-এর সাথে সম্পর্কিত।

শিক্ষা জীবন

শৈশব থেকেই শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। সাত বছর বয়সে তিনি আল কুরআন মুখস্থ করেন। তাঁর আব্বার তত্ত্বাবধানে তিনি ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়ে উঠেন। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো অসাধারণ। ইসলামের আইন-বিজ্ঞান ছিলো তাঁর নখদর্পণে। তিনি ছিলেন বিশ্লেষণী মনের অধিকারী।

কর্মজীবন

হিজরী ১১৩১ সালে শাহ্ আবদুর রহীম ইন্তেকাল করেন। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মাদরাসা রহীমিয়ায় তাঁর আব্বার স্থলাভিষিক্ত হন। এ কাজে তিনি একটানা বারোটি বছর নিয়োজিত থাকেন।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মোগল সম্রাট আওরংগজেবের শাসনকালে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি যখন বয়স্ক হন তখন যারা দিল্লীর মসনদে বসেন, তাঁরা না ছিলেন ইসলামের সেবক, না ছিলেন ভালো শাসক। তিনি যেসব সম্রাটের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন বাহাদুর শাহ্, মুয়ীনুদ্দীন জাঁহাদার শাহ্, ফররুখ শিয়র, রাফিউদ্দারাজাত, রাফিউদ্দৌলা, মুহাম্মদ শাহ্, আবু নসর আহমদ শাহ্, দ্বিতীয় আলমগীর এবং শাহ্ আলম।

আওরংগজেবের মৃত্যুর পর মোগল শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন খুবই দুর্বল। ভোগ-বিলাস ছিলো তাঁদের জীবনাদর্শ।

দিল্লীর দুর্বলতার সুযোগে পাঞ্জাবে শিখেরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাঁরা মুসলিমদের সাথে ভীষণ দুশমনী শুরু করে। তাদের নির্যাতনে মুসলিমদের

জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শিশু ও নারীরা পর্যন্ত তাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতো না।

অপরদিকে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মারাঠারা। এরা ছিলো কট্টর জাতীয়তাবাদী হিন্দু। হিন্দু সভ্যতার পুনর্জাগরণ ছিলো তাদের লক্ষ। তাদের হাতে মুসলিমদের জানমালের বিপুল ক্ষতি হয়। একবার তারা দিল্লীতে এসেও লুটতরাজ করে।

পূর্ব দিকে শুরু হয় ইংরেজদের উৎপাত। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে চলে যায়। কলিকাতায় ইংরেজ প্রশাসনের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

আঞ্চলিকতাবাদের খপ্পরে পড়ে উপমহাদেশের মুসলিমগণ তখন পরস্পর লড়াইতে ব্যস্ত। সেনাপতি ও সৈন্যদের মনে জিহাদী প্রেরণা ছিলো না। ধর্মীয় নেতারা ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া সমাজে তাঁদের প্রভাবও বড্ড একটা ছিলো না। মুসলিম জনগণ আত্মভোলা হয়ে পড়েছিলো। দেশের কোথায় কি ঘটছে সে সম্বন্ধে তারা ছিলো উদাসীন। ইসলামের নামে অনেক ইসলাম বিরোধী কাজ সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সত্যিকার ইসলামের বিকাশ ঘটানোর কোনো বলিষ্ঠ উদ্যোগ ছিলো অনুপস্থিত।

উপমহাদেশের মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের অবস্থা দেখে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ ব্যথিত হন। তিনি বুঝলেন যে, এসব কিছুর মূলীভূত কারণ ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং ঈমানী শক্তির অভাব। তিনি মিল্লাতকে ইসলামের জ্ঞান দান এবং ঈমানী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। মাদরাসার শিক্ষকতার দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে অর্পণ করে তিনি হাতে কলম তুলে নিলেন। দিনরাত পরিশ্রম করে তাঁর চিন্তাগুলোকে বইয়ের আকার দিলেন।

সম্রাটের পরিষদগণকে লক্ষ করে তিনি লিখেন ঃ "তোমাদের কি আল্লাহর ভয় নেই ? তোমরা আরাম ও বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবার সুযোগ দিচ্ছ। প্রকাশ্যে শরাব পান চলছে, অথচ তোমরা বাধা দিচ্ছো না।....এ বিশাল দেশে দীর্ঘকালের মধ্যে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কোনো অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হয়নি। তোমরা

দুর্বলকে শেষ করে ফেলছো, আর শক্তিমানকে দিচ্ছো রেহাই। বিবিধ খাদ্যের স্বাদ, স্ত্রীদের মান-অভিমান ভঞ্জন এবং আবাস ও পোশাকের বিলাসিতার মধ্যেই তোমরা ডুবে আছো। একটিবার আল্লাহ্‌র কথা চিন্তা করো না।"

সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে তিনি লিখেন ঃ "আল্লাহ্ তোমাদেরকে জিহাদ করার জন্য, সত্যের বাণী বুলন্দ করার জন্য এবং শির্কের শক্তি খর্ব করার জন্য সৈন্যে পরিণত করেছিলেন। ......এখন জিহাদের নিয়ত ও লক্ষ্যের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থ উপার্জনের জন্য তোমরা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছো।"

শ্রমজীবীদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেন ঃ "বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ্‌র ইবাদাত থেকে তোমরা গাফেল হয়ে গেছো।"

তাকওয়া ও পরহেজগারীর দাবিদারদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেন ঃ "ওহে তাকওয়া ও পরহেজগারীর দাবিদারগণ ! তোমরা এখানে ওখানে ছুটে বেড়াচ্ছো এবং ভালো-মন্দ সবকিছু তুলে নিচ্ছো। তোমরা মানুষকে মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়ের দিকে আহ্বান করছো। তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের জীবনের পরিধি সংকীর্ণ করে দিয়েছো, অথচ সংকীর্ণতা নয়, ব্যাপকতার জন্য তোমরা আদিষ্ট হয়েছিলে।"

তিনি আরো লিখেন, "ওহে বনী আদম! তোমরা নিকৃষ্ট রসম-রেওয়াজের অনুসারী হয়ে পড়েছো যার ফলে দীন বিকৃত হয়ে গেছে। যেমন, আশুরার দিন তোমরা বাজে কাজে লিপ্ত হও।....শবেবরাতে তোমরা মূর্খ জাতিগুলোর ন্যায় খেলা-ধুলায় মত্ত হও। তোমাদের একটি দল মনে করে ঐ দিন মৃতদের কাছে বেশী করে খাদ্য পাঠানো উচিত। তোমরা এমন সব রসম-রেওয়াজ বানিয়ে রেখেছো যার ফলে তোমাদের জীবনধারা সংকীর্ণ হয়ে গেছে।.....তোমরা সত্য ও সুন্দর হেদায়াতকে পরিত্যাগ করেছো।.......তোমরা মৃত্যু ও দুঃখকে ঈদে পরিণত করেছো। মনে হয় তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে যে, কারো মৃত্যু হলে তার আত্মীয়-স্বজনকে বিরাট ভোজসভায় আপ্যায়ন করতে হবে। তোমরা সালাত থেকে গাফেল হয়ে গেছো। ....তোমরা যাকাত দিতে অমনোযোগী।.......তোমরা রমজানের রোজা বিনষ্ট করে থাকো এবং

এজন্য নানা ধরনের ওজর পেশ করে থাকো। তোমরা নিতান্ত অকর্মণ্য ও অবিবেচক হয়ে পড়েছো।"

"মুসাফ্ফা" গ্রন্থে শাহ ওয়ালী উল্লাহ লিখেন ঃ "আমাদের যামানার নির্বোধ ব্যক্তিরা ইজতিহাদের নামে ক্ষেপে ওঠে। এদের নাকে উটের মতো দড়ি বাঁধা আছে। এরা জানে না, কোন্ দিকে এরা যাচ্ছে। এদের ব্যাপার অদ্ভূত রকমের। ওসব ব্যাপার বুঝার যোগ্যতাও বেচারাদের নেই।"

"ইজতিহাদ প্রতি যুগে ফরজে কেফায়া। এখানে ইজতিহাদ অর্থ হচ্ছে শরীয়তের বিধানাবলী সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন এবং এগুলোর খুঁটিনাটি বিষয়ের ব্যাখ্যা অনুধাবন করে শরীয়তের আইন কানুনকে যথাযথভাবে সংযোজন ও সংগঠন করা, তা কোনো বিশেষ মাযহাব প্রণেতার অনুসারীও হতে পারে। আর ইজতিহাদ প্রতি যুগে ফরজ হবার যে কথা বলেছি তা এজন্য যে, প্রতি যুগে অসংখ্য স্বতন্ত্র সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেগুলো সম্বন্ধে আল্লাহ এবং রাসূলের হুকুম জানা ওয়াজিব হয়ে পড়ে।"

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, আদর্শিক শক্তি ছাড়া কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই কোনো জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। আর সেজন্য মুসলিম মিল্লাতের চিন্তার পুনর্গঠনের দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিলো বেশী।

ইজালাতুল খিফা, ইনসাফ, বুদুরে বাজিগাহ, মুসাফ্ফা, ইকদুলজীদ, তাফহীমাতে ইলাহীয়া, আনফাসুল আরেফীন, আল খায়রুল কাসীর এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা তাঁর অমর গ্রন্থ। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে তিনি ইসলামী জিন্দেগীর নিখুঁত বিশ্লেষণ পরিবেশন করেছেন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বিশ্বাস করতেন যে, যদি শাসক গোষ্ঠী ভোগ-বিলাস ও ঐশ্বর্যশালী জীবন বেছে নেয়, তবে সে বিলাসী জীবনের বোঝা সাধারণ মানুষের ওপর এসে পড়ে এবং সমাজের অধিকাংশ মানুষ পশুর মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এরই পরিণতিতে সমাজে বিপ্লবী হাওয়া বইতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত বড়ো রকমের ওলট পালট ঘটে যায়।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বিশ্ব নবীর পরিচালিত মক্কার ইসলামী আন্দোলনকে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পূর্ণাংগ ইসলামী চরিত্রের অধিকারী না হয়ে শুধুমাত্র অস্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তিনি এক শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে সে চরিত্র সৃষ্টির দিকেই মনোযোগ দিলেন।

তার এ নীরব আন্দোলনের তাৎপর্য বুঝার মতো লোক সমাজে ছিলো। কিছু লোক তো তাঁর বিরুদ্ধে হৈ চৈ শুরু করে দেয়। তারা এ আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা শুরু হয়। এক শ্রেণীর স্বার্থান্ধ লোক তো তাঁর ওপর কুফরী ফতোয়া দিয়ে বসে। কেউ কেউ তো চক্রান্ত করলো তাঁকে মেরে ফেলার জন্য। ফতেহ্পুর মসজিদে একবার তিনি দুশমনদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁর সহকর্মীরা দ্রুত এগিয়ে আসেন এবং তাঁকে মসজিদ থেকে সরিয়ে নেন।

শাহ সাহেব দিল্লীর একটি নগণ্য এলাকায় অবস্থিত তাঁর মাদরাসা থেকে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন। সম্রাট মুহাম্মদ শাহ্ এ শিক্ষানিকেতনটির অবস্থানস্থল দেখে সুখী হতে পারেননি। তিনি শাহ্জাহানাবাদ-এর একটি বিস্তৃত এলাকা এটির জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। পরবর্তীকালে শিক্ষা নিকেতনটি সেখানে স্থানান্তরিত হয়। ওখান থেকেই শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ তাঁর আন্দোলন পরিচালনা করেন।

তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রগণ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। বিভিন্ন স্থানে তাঁরা শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁদের শিক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকে বহু তরুণ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্র চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বের হতে থাকে।

শাহ্ সাহেবের চার পুত্র ছিলেন। এরা হলেন শাহ্ আবদুল আজিজ, শাহ্ রফীউদ্দিন, শাহ্ আবদুল কাদির এবং শাহ্ আবদুল গনি। তাঁর পুত্র এবং ছাত্রদের মধ্যে শাহ্ আবদুল আজিজই ছিলেন তাঁর মিশনের নেতৃত্ব দানের যোগ্যতম ব্যক্তি।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ জীবনের শেষ ভাগে মুসলিমদের ওপর একটি বড়ো বিপদ দেখে যান। এ সময়ে মারাঠারা মোগল রাষ্ট্রটিকে তছনছ করে চলছিলো। দিল্লীর আশেপাশে এবং খোদ দিল্লীতেও তাদের আক্রমণ শুরু হয়। মুসলিম রক্তে রঞ্জিত হয় মারাঠাদের কৃপাণ। বহু নারী লাঞ্ছিতা হন। বহু ঘরবাড়ী হয় লুণ্ঠিত। নওয়াব নজীবউদ্দৌলা ছিলেন শাহ্ সাহেবের ভক্ত। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর কাছে এসে পরামর্শ চাইলেন। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ পরামর্শ দেন খাইবারের ওপার থেকে আহমদ শাহ্ আবদালীকে ডেকে আনতে। নজীবউদ্দৌলা শাহ্ সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। আহমদ শাহ্ আবদালী দিল্লীর মজলুম মুসলিমদের

ডাকে সাড়া দেন। তিনি এগিয়ে আসেন সৈন্য বাহিনী নিয়ে। মারাঠাদের মধ্যে সাজসাজ রব পড়ে যায়। হিজরী ১১৭৪ সালে পানিপথে উভয় বাহিনীর মুকাবিলা হয়। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর মারাঠা শক্তি পরাজয় বরণ করে। পানিপথে আহমদ শাহ্ আবদালীর বিজয় দিল্লীর মুসলিম শাসনের আয়ু বাড়িয়ে দেয়। আর এ সুযোগে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্র আন্দোলন উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। শাহ্ সাহেবের অনুসারীগণ ইসলামী জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন।

ইন্তেকাল

হিজরী ১১৭৬ সালে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ ইন্তেকাল করেন।

সাইয়েদ
মুহাম্মাদ
ইবনে
আলী
আস-সেনৌসী র.

বনী উমাইয়া শাসক ইয়াজিদের সময় মদীনায় হযরত আলী রা.-এর বংশধরদের ওপর ভীষণ অত্যাচার শুরু হয়। সে সময় সে বংশের ইমাম ইদ্রিস মদীনা থেকে পালিয়ে যান। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা এসে পৌঁছেন। ঈসায়ী ৭৮৮ সালে তাঁরই উদ্যোগে মরক্কোতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পত্তন হয়। আল মুরাবীদুন শাসন প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ইদ্রিস বংশীয়গণ শাসন করেন। নতুন বংশের দ্বিতীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন ইউসুফ বিন তাশফীন। ইদ্রিস বংশীয়গণ কেবলমাত্র মরক্কোতে বসবাস করতেন না, উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এদের উত্তর-পুরুষগণ ছড়িয়ে পড়েছিলেন। একটি পরিবার আলজিরিয়াতে এসে বসতি স্থাপন করে। এ পরিবারেরই এক কৃতী সন্তান ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আলী আস-সেনৌসী। ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে তিনি মুসতাগানিম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

বাল্যকালে তিনি আল-কুরআন মুখস্থ করেন। মুস্তাগানিমে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শেষ হয়। এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি মরক্কো আসেন। সুযোগ্য শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে তিনি আল কুরআনের বিশ্লেষণ শিখেন। হাদীসশাস্ত্রে অর্জন করেন পাণ্ডিত্য। ইসলামী আইন-বিজ্ঞানে তিনি পারদর্শী হয়ে উঠেন। আরবী ভাষার ওপরও তাঁর চমৎকার দখল ছিলো।

কর্মজীবন

মরক্কোর সুলতান সুলাইমান তাঁকে কোনো রাজকীয় পদে বসাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে আলী সে পদ গ্রহণ করতে রাজী হননি। তাঁর মন ছিলো ভিন্ন দিকে। তিনি মরক্কো ত্যাগ করেন। ভ্রাম্যমান শিক্ষকরূপে লিবিয়া, তিউনিসিয়া এবং মিসর সফর করেন। তিনি মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করে জ্ঞান-চর্চা ও গবেষণা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু তা তিনি করতে পারেননি। ইতিমধ্যেই ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভংগীর কথা অনেকে জেনে ফেলে। স্বার্থপর ও অলস ইসলামপন্থীরা এ চিন্তাধারার কথা শুনে আঁতকে ওঠে। আবার তাঁর পাণ্ডিত্য অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কায়রো থেকে আস-সেনৌসী তাই বিদায় নেন। তিনি পৌঁছেন মক্কায়। এখানে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও আধ্যাত্মিক নেতাদের সাথে মিলিত হন। তাঁদের সাথে মত বিনিময় করেন। কিন্তু আন্দোলন-পরিকল্পনার কথা শুনে অনেকেই ভয় পান। অতঃপর তিনি ইয়ামেন আসেন। ১৮৩৭ সালে তিনি আবার মক্কায় ফিরেন। এখানে এবার তিনি একটি বাড়ী নির্মাণ করালেন। এ বাড়ীটি ছিলো তাঁর আন্দোলনের সূতিকাগার। কিছু লোক তাঁর চিন্তাধারার অনুসারী হন।

মুহাম্মাদ ইবনে আলী তাই করতে চেয়েছিলেন, তাঁর পূর্বে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম গাজ্জালী এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া যা করেছেন। তিনি চাচ্ছিলেন একটি পূর্ণাংগ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। এ উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার সিরেনিকা, ত্রিপোলী প্রভৃতি অঞ্চল বেছে নেন। এসব অঞ্চলেও তাঁর অবস্থানস্থল তৈরী হয়। এগুলোই ছিলো তাঁর আন্দোলনের কার্যালয়।

১৮৩০ খৃস্টাব্দে আলজিরিয়া তুর্কী খিলাফতের হাত ছাড়া হয়ে ফরাসীদের অধীনে চলে যায়। আমীর আবদুল কাদির আলজিরিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই শুরু করেন। তিনি একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। ফরাসীদেরকে তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত করতে সক্ষম হন। অবশেষে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ফরাসীদের হাতে বন্দী হন।

মুহাম্মাদ ইবনে আলীর ইসলামী আন্দোলন তখন শৈশবে। তিনি আন্দোলনের ভবিষ্যত নিয়ে গভীরভাবে ভাবলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। শহরের প্রভাব মুক্ত মরুভূমির অভ্যন্তরভাগে ছিলো একটি মরুদ্যান। এ মরুদ্যানের নাম ছিলো জাগবুব।

১৮৫৩ খৃস্টাব্দে মুহাম্মাদ ইবনে আলী জাগবুবে পৌঁছেন। সাথে আসেন তাঁর আন্দোলনের কর্মীরা। সে সময় থেকে তাঁর আন্দোলনের কেন্দ্র ছিলো জাগবুব। মরুদ্যানের বেদুইনদের সাথে তিনি ওঠা-বসা শুরু করেন। তাদের পারস্পরিক বিবাদগুলো মিটিয়ে দেন। তাদের কাছে ইসলামী জ্ঞান বিতরণ করতে থাকেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গড়ে ওঠে ইসলামের একটি খাঁটি কর্মীবাহিনী। ইমাম এ বাহিনীর প্রশিক্ষণ কাজ নিয়ে দিন-রাত ব্যস্ত থাকতেন।

এর কিছুকাল পর চাদ হ্রদ এবং সিরেনিকার মধ্যবর্তী ২০ হাজার বর্গমাইলব্যাপী অঞ্চলে কুফরা নামক স্থানে আরেকটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

এখানে প্রেরিত হন ইমাম সাহেবের হাতে গড়া এক দল মানুষ। তাঁরা কুফরা এবং এর নিকটবর্তী এলাকার মরুচারীদের কাছে গিয়ে ইসলামের সঠিক দাওয়াত পরিবেশন করতে লাগলেন। অনেকেই সে দাওয়াত গ্রহণ করেন। কুফরাবাসীরা এবং তাঁদের প্রতিবেশীরা ইসলামের জন্য জান কোরবান করার শপথ গ্রহণ করেন।

১৮৫৯ খৃস্টাব্দে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইন্তেকাল করেন।

আন্দোলনের অব্যাহত গতি

মুহাম্মাদ ইবনে আলী তাঁর মিশন সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। তবে তার মৃত্যুতেও ইসলামী আন্দোলনের গতি থেমে যায়নি। আন্দোলনের নেতৃত্ব পদে আসীন হন তাঁর পুত্র আলী মাহদী।

সাইয়েদ আলী মাহদী ছিলেন বলিষ্ঠ সংগঠক। তাঁর নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলন আরো গতিশীল হয়ে ওঠে। জাগবুব একটি ইসলামী শহররূপে গড়ে উঠে। বরং জাগবুবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একটি ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র। জাগবুবে নির্মিত হয় একটি বড়ো মসজিদ। স্থাপিত হয় একটি শিক্ষা নিকেতন। শিক্ষা-নিকেতনের সাথে ছিলো ছাত্রাবাস। আশেপাশে বসতি স্থাপন করেছিলো সেনৌসী আন্দোলনের কর্মীগণ।

জাগবুবের চারদিকে ছিলো মরুভূমি। মরুভূমি আবাদের পরিকল্পনা নেয়া হয়। অনেক গাছ লাগানো হয় সেখানে। ধীরে ধীরে বালু আর কংকরে পরিপূর্ণ মাঠ সবুজ রূপ ধারণ করে। জাগবুবে ছিলো একটি বড়ো রকমের কূপ। সেখান থেকে সুবিস্তৃত এলাকায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা চালু হয়। শাক-সব্জীতে ভরে ওঠে বাগান।

জাগবুবের শিক্ষা-নিকেতনটি ছিলো অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শিক্ষার্থীদেরকে আল কুরআন, হাদীস, ইসলামী আইন-বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং যুক্তিবিদ্যা পড়ানো হতো। সাথে সাথে দেয়া হতো বাস্তব কাজের ট্রেনিং। তাদেরকে শেখানো হতো কর্মকারের কাজ। শেখানো হতো কাঠ-মিস্ত্রীর কাজ। অট্টালিকা তৈরীর কাজও শেখানো হতো। সুতা কাটা, কাপড় বুনন, বই-বাঁধাই, মাদুর তৈরী ইত্যাদি কাজ বাধ্যতামূলকভাবে সবাইকে শিখতে হতো। তদুপরি প্রতি জুমাবারে সব ছাত্রকে সামরিক ট্রেনিং দেয়া হতো।

ছাত্রদেরকে অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত করে তোলা হয়। কষ্ট সহিষ্ণুতার ট্রেনিং দেয়া হয়। সর্বোপরি তাদের নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা বিকাশের দিকে বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

জাগবুব ছিলো একটি শিক্ষা-শহর। ছিলো একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। একটি শিল্প নগর। এখানে ব্যাংক ছিলো। বিচারব্যবস্থা ছিলো। ছিলো একটি বড়ো কবরস্থান। সর্বোপরি গোটা জাগবুব ছিলো একটি দুর্গ। বস্তুত জাগবুব ছিলো মরু অঞ্চলের একটি ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী।

সেনৌসীদের প্রতিটি কেন্দ্রের চেহারা ছিলো এক। প্রতিটি কেন্দ্রের প্রশাসন, প্রতিটি কেন্দ্রে বসবাসকারিদের প্রশিক্ষণব্যবস্থা একই রকমের ছিলো। প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে উঠেছিলো অতি সুন্দর ও পবিত্র পরিবেশ। প্রতিটি কেন্দ্রে ছিলো কর্মচাঞ্চল্য। ইসলামের অনাবিল শান্তি ছড়িয়ে পড়েছিলো চারদিকে। সবাই ভোগ করছিলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। বিস্ময়কর ভ্রাতৃত্ববোধ দৃষ্ট হতো সবখানে।

কিন্তু সেনৌসিদের এ সাফল্য অনেকের মনেই জ্বালা সৃষ্টি করেছিলো। শহরগুলো তখন ফরাসীদের দখলে। মরুভূমির অভ্যন্তরভাগে সেনৌসীদের যে বিপ্লব ধারা প্রবাহিত হচ্ছিলো তাঁর খবর পায় ফরাসীরা। তাদের মনে আতংক সৃষ্টি হয়। ইসলামের শক্তি সম্বন্ধে তারা ছিলো ওয়াকিফহাল। কাজেই আরো শক্তিশালী হবার আগেই সেনৌসীদের কেন্দ্রগুলোকে বিনাশ করার জন্য তারা প্রস্তুতি নেয়। তারা জানতো এ কেন্দ্রগুলো অক্ষত থাকলে আফ্রিকার ফরাসী কর্তৃত্ব শিকড় গাড়তে সক্ষম হবে না।

১৯০২ খৃস্টাব্দে ফরাসী সেনাবাহিনী সেনৌসীদের কেন্দ্রগুলোর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এ বছরেই আলী মাহদী ইন্তেকাল করেন। আন্দোলনের নেতৃত্ব আসে সাইয়েদ আহমদ আশ্‌শরীফের হাতে।

নেতৃত্ব পদে আসীন হয়ে তিনি ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজে মনোযোগ দেন। জিহাদ ঘোষিত হয়। আন্দোলনের সব কর্মীরা অস্ত্র সজ্জিত হন। ফরাসী সেনাদের সাথে ইসলামের মুজাহিদদের লড়াই চলে বিভিন্ন রণাঙ্গনে। বছরের পর বছর ধরে এ লড়াই অব্যাহত থাকে। ফরাসীরা সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে। অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে হামলা শুরু করে। ১৯০৯ সালে এসে সেনৌসী মুজাহিদগণের অনেকগুলো ঘাঁটি ফরাসী সেনাদের দখলে চলে যায়।

ত্রিপোলী, বেনগাজী এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের সেনৌসীদের ঘাটিগুলো থেকে তখন ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে। কিন্তু এখানেও শিগগিরই বিপদ নেমে আসে।

১৯১১ খৃস্টাব্দে ইটালীর ডিকটেটর মুসোলিনীর সৈন্যদল ত্রিপোলী ও বেনগাজীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেনৌসীদের ঘাঁটিগুলোতে জিহাদী হাঁক শুনা গেলো। রণাঙ্গনে নেমে এলেন হাজার হাজার মুজাহিদ। দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে।

১৯১৭ সালে সাইয়েদ আহমদ আশ্‌শরীফ তুর্কীদের সাহায্য আদায়ের জন্য ইস্তাম্বুল আসেন। এখানে এসে তিনি বিভিন্ন চক্রান্তের শিকার হন। ফলে তাঁর দেশে ফেরা বিলম্বতি হয়। তিনি মুস্তফা কামাল পাশার সাথে মিলিত হয়ে তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই করেন। কিন্তু বিজয়ের পর কামাল পাশা ইসলামের বিরুদ্ধেই অভিযান শুরু করেন। ক্ষুণ্ন মনে আশ্‌ শরীফ ১৯২৩ খৃস্টাব্দে দামেস্কে পৌছেন। কিন্তু তিনি জানতে পেলেন যে, তাঁকে গ্রেফতার করার চেষ্টা চলছে। এ সংবাদ পেয়ে তিনি মোটর যোগে গোপনে যাত্রা করে আরবে এসে পৌছেন।

এ দিকে ত্রিপোলী ও বেনগাজীর রণাঙ্গনে সিংহের মতো লড়ে চলছিলেন আলী মাহদীর পুত্র সৈয়দ মুহাম্মাদ আল ইদ্রিস, ওমর আল-মুখতার এবং হাজারো মুজাহিদ।

ফ্যাসিষ্ট ইটালী ছিলো সামরিক দিক দিয়ে অতি শক্তিশালী। ইটালীয়ান সৈন্যদের হাতে ছিলো উন্নত মানের হাতিয়ার। এদের সাথে লড়াই করা সোজা কথা ছিলো না। কিন্তু তবুও মুজাহিদগণ গেরিলা লড়াই অব্যাহত রাখেন।

ইটালীর বিমান বহর মরু অঞ্চলে উড়ে উড়ে সেনৌসী মুজাহিদদের ঘাঁটি দেখে নিতো। সাঁজোয়া বাহিনী ঘাঁটিগুলোর ওপর হামলা চালাতো। এদের দূর পাল্লার ভারী অস্ত্রের সম্মুখে মুজাহিদগণ ছিলেন নিরূপায়। এক একটি ঘাটির পতন হতো, আর ইটালিয়ান সৈন্যগণ হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ চালিয়ে জাহান্নামের পরিবেশ সৃষ্টি করতো।

কেবলমাত্র ঈমানী শক্তি এবং কিছু সেকেলে হাতিয়ার নিয়ে বছরের পর বছর লড়াই করেন ইসলামের মুজাহিদগণ। তাঁদের অনেকেই হন বন্দী। অনেকেই হন শহীদ।

১৯৩২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এ লড়াই চলে। ওমর আল-মুখতার এ বছরই যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন। ফলে সেনাপতিত্বের অভাব, যোদ্ধার অভাব এবং রসদের অভাবে শেষ পর্যন্ত মুজাহিদদের পক্ষে আর রণাঙ্গনে নামা সম্ভব হয়নি। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে মদীনায় ইন্তেকাল করেন সাইয়েদ আহমদ আশ্ শরীফ।

১৮৩৭ খৃস্টাব্দে সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইসলামের মশাল জ্বেলে ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ মুজাহিদদেরকে এক পর্যায়ে এসে সামরিক পরাজয় বরণ করতে হয়েছে, এটা সত্য। কিন্তু ইসলামী পুনর্জাগরণের যে জোয়ার তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তা আজো আটলান্টিকের বেলাভূমিকে মুখরিত করে তুলছে।

বদীউজ্জামান
সাঈদ
নূরসী র.

তুরস্কের বিতলিস প্রদেশের অধীন হিজান জিলার একটি গ্রাম নূরস। এ গ্রামের এক কৃতী সন্তান বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসী। তাঁর আব্বার নাম মীর্জা নূরসী। হিজরী ১২৯০ সাল মুতাবিক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সাঈদ নূরসী জন্মগ্রহণ করেন। নূরসী ছিলেন এক কুর্দ পরিবারের সন্তান।

শিক্ষাজীবন

আব্বা আম্মার স্নেহছায়ায় কেটে গেলো তাঁর জীবনের ন'টি বছর। ভাই আবদুল্লাহ তখন ইসলামী শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠছিলেন। ভাই তাঁকে জ্ঞানার্জনে বিশেষভাবে উৎসাহী করে তোলেন। বাল্যকালে বদীউজ্জামান মুখস্থ করে নেন পুরো আল কুরআন। ব্যাপকভাবে হাদীস পড়েন ও শিখেন। ইসলামী আইন বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অতি স্বচ্ছ। দর্শনশাস্ত্রেও তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পরিণত বয়সে তিনি ভূগোল ও ইতিহাসে দক্ষতা অর্জন করেন। পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানে তাঁর দক্ষতা ছিল বিস্ময়কর। মাতৃভাষা শিখেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তিনি শিখেছিলেন বেশ কয়েকটি বিদেশী ভাষা। মোটকথা বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসী ছিলেন জ্ঞানের এক মহাসাগর। তাঁর প্রাথমিক জীবনের উস্তাদদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন মোল্লা মুহাম্মাদ আমীন, সৈয়দ নূর মোহাম্মাদ এবং শেখ মুহাম্মাদ জালালী। শেখ মুহাম্মাদ জালালীর সান্নিধ্যে তাঁর জীবন সুশোভিত হয়ে ওঠে।

কর্মজীবন

ভান প্রদেশের প্রশাসক হাসান পাশা ইসলামের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁর এলাকার লোকদেরকে ইসলামের জ্ঞান দেয়ার জন্য সাঈদ নূরসীকে আহ্বান জানান। নূরসী সে ডাকে সাড়া দেন। ভান প্রদেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে তিনি আল কুরআন এবং হাদীস বিশ্লেষণ করে লোকদেরকে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন।

সাঈদ নূরসীর জীবনযাত্রা ছিলো অতি সরল। তাঁর জীবনে বিলাসিতা ছিলো না। ছিলো না ভোগবাদের সামান্যতম ছোঁয়াচ। ইসলামের নির্দেশাবলী পালনে তিনি ছিলেন নিরলস। বৈধ ও অবৈধের তারতম্যের ক্ষেত্রে তিনি বিন্দুমাত্রও শৈথিল্য বা উদাসীনতা দেখাতেন না।

সাঈদ নূরসী তুর্কদের নৈতিক অধঃপতন দেখে ব্যথিত হন। তিনি চেষ্টিত হন ইসলামের মৌলিক ও বিপ্লবী জ্ঞানের সাথে এদের পরিচিতি ঘটাতে। ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা তখন তুর্কদের মন-মানসিকতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তুর্কী সমাজে প্রচলিত ছিলো ইউরোপীয় জীবনযাত্রা প্রণালী। মানসিকতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তুর্কীগণ ইউরোপের গোলাম সেজে বসেছিলো। নূরসী দেশে প্রচলিত শিক্ষার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে ছিলেন ওয়াকিফহাল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আদর্শিক জ্ঞান এবং বিজ্ঞান একই সময়ে ছাত্রদের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। তিনি পূর্ব আনাতোলিয়াতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

তুর্কী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন দানা বেঁধেছে ভালোভাবে। ইয়ং টার্কস এ সময় ইসলামের প্রতি তাদের বৈরী মনোভাব প্রকাশ করে। সাঈদ নূরসী তাদের সমালোচনা করেন এবং তাদের চিন্তার ভ্রান্তি উন্মোচনের প্রচেষ্টা চালান। তিনি তাদেরকে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। এ কারণে তিনি জাতীয়তাবাদীদের চক্ষুশূলে পরিণত হন।

এ সময়ে নূরসী সংঘবদ্ধ তৎপরতার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। যেসব মর্দে মুমিন ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি তাঁদেরকে নিয়ে গড়ে তোলেন একটি সংগঠন। এর নাম রাখা হয় ইত্তিহাদ-ই মুহাম্মাদী। তিনি এবং তাঁর সহকর্মীগণ আল কুরআন এবং হাদীসের আলোকে জনগণের চিন্তাধারা পুনর্গঠনের আন্দোলন শুরু করেন প্রবলভাবে।

জাতীয়তাবাদীরা তখন প্রশাসন যন্ত্রে জেঁকে বসেছে। তারা নূরসীর ইসলামী আন্দোলন পসন্দ করতে পারলো না। সাঈদ নূরসী এবং বেশ কিছু সহকর্মীকে গ্রেফতার করা হয় ১৯০৯ খৃস্টাব্দে। সামরিক আদালতে তাঁদের বিচার হয়। আদালত ১৫ জন কর্মীকে ফাঁসীর হুকুম শুনান। বিচারক খুরশীদ পাশা এ সময়ে সাঈদ নূরসীকে লক্ষ করে বলেন, আপনি কি এখনো ইসলামী আইনের প্রবর্তন চান ?" নির্ভীক কণ্ঠে নূরসী ঘোষণা করেন, "আমার যদি এক হাজার জীবন থাকতো আমি তা অকাতরে ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিতাম। ইসলামের বিপরীত কোনো কিছু আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।"

নূরসীর বিচার অনুষ্ঠানের কাহিনী জনমনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। জনমতের কাছে নতি স্বীকার করে সরকার এ যাত্রা নূরসীকে ছেড়ে দেন।

সামরিক আদালত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তিনি তিফলিসে যান। সেখানে খোঁজেন একটি নিভৃত স্থান একটি আদর্শ শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। এরপর তিনি আসেন ভান। ভানে অবস্থানকালে তিনি লিখেন 'মুনাজারাত' নামক গ্রন্থটি। কিছুকাল পর তিনি দামেস্কে যান। দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে দাঁড়িয়ে দশ হাজার মুসলিমের উদ্দেশ্যে তিনি একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। তিনি মুসলিম জাতির সমস্যা ও সমাধান বিশ্লেষণ করেন এ ভাষণে। এ সময়ে সিরিয়ার অপরাপর শহরেও তিনি বক্তৃতা করেন। এসব বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিলো ঘুমন্ত মিল্লাতকে জাগানো। বক্তৃতাগুলোর সমষ্টি "আল খুতাবাতুশ্‌শামীয়া" নামে প্রকাশিত হয় পরবর্তী সময়ে। সফর শেষে তিনি ইস্তাম্বুল ফিরেন। জাহ্‌রা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গ্রহণ করেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছিলেন সুলতান মুহাম্মাদ রাশাদ। নূরসীর পরিশ্রমের ফলে ভান প্রদেশে ভান হ্রদের তীরে বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে উঠতে যাচ্ছিলো। কিন্তু ইউরোপে রণ-দামামা বেজে উঠায় পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়।

এ সময়টি ছিলো মুসলিম তুর্কদের কলংকের যুগ। যারা একদিন এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার বিশাল অঞ্চল দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করেছে তারা তখন নিস্তেজ, প্রাণহীন। তাদের ঈমানী শক্তি হারিয়ে গিয়েছিলো। দুর্বল হয়ে পড়েছিলো বাহুবল। ইস্তাম্বুলের মসনদে আসীন ছিলেন নামকাওয়াস্তের এক খলীফা। তার না ছিলো হিম্মত। না ছিলো বিচক্ষণতা। প্রশাসন যন্ত্র দখল করে বসেছিলো যারা তারা নামে মুসলিম ছিলো বটে, কিন্তু কাজে ছিলো ইউরোপীয়। দেশে জাতীয় ঐক্যবোধ ছিলো না। জনগণের আশা-আকাঙ্খা এবং শাসকদের মর্জির মধ্যে চলছিলো টাগ-অব-ওয়ার। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনীতির ধুম্রজালে জনগণ তখন দিশেহারা।

মুসলিম তুর্কদের এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে ইউরোপীয় শক্তিগুলো। কূটনৈতিক ও সামরিক চাপ প্রয়োগ করা হয় তুর্কীদের ওপর। সার্ভিয়া, মন্টেনেগ্রো এবং রুমানিয়া তুর্কীদের হাত থেকে খসে পড়ে। কিছুকাল পর হাত ছাড়া হয় ক্রীট দ্বীপ। আরো পরে অষ্ট্রিয়া ও বোসনিয়া।

সাঈদ নূরসী সাবধানবাণী শুনালেন জাতিকে। ইসলামের শক্তি ছাড়া আর কোনো শক্তি যে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে না সে কথা তিনি

জানালেন মিল্লাতকে। কিন্তু তুর্কী শাসকগণ ইসলামের কথা শুনে নাক সিটকাতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দাবানলে দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে নূরসী তাঁর সহকর্মীদেরকে বলেন, প্রস্তুত হও, এক মহা বিপদ আসন্ন।"

শিগ্‌গিরই তিনি ঝাপিয়ে পড়েন রণাঙ্গনে তাঁর আন্দোলনের কর্মীদেরকে নিয়ে। নূরসী ভলান্টিয়ারস রেজিমেন্টের কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। রাশিয়ান সেনারা এগিয়ে আসে ভান প্রদেশের দিকে। আকাশ-বাতাশ কাঁপিয়ে তোলে মজলুম নর-নারীর করুণ আর্তনাদ। ভানবাসীদের উদ্ধার এবং অপসারণের কাজে এগিয়ে যান সাঈদ নূরসী তাঁর রেজিমেন্ট নিয়ে। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে বিপর্যয়মুক্ত হয় হাজার হাজার পরিবার।

যুদ্ধের ময়দানে অবসরকালে তিনি একটি গ্রন্থের ভাষা ডিক্টেট করতেন। বইটি লিখতেন মোল্লা হাবীব। এ গ্রন্থের নাম "ইশারাত আল-ইজাজ"।

নূরসী ভলান্টিয়ারদের সাথে থেকে যুদ্ধে অংশ নিতেন। একবার শত্রুর গুলীতে তিনি আহত হন। কিন্তু সংগীরা নিরুৎসাহিত হবে আশংকা করে তিনি নিরাপদ স্থানে সরে যেতে রাজী হননি।

বিতলিস রণাঙ্গনে তিনি প্রদর্শন করেন অদম্য সাহস। বিতলিস অচিরে শত্রুদের দখলে চলে যায়। তিনি শত্রুসেনাদের মুকাবিলা করে চলছিলেন ছোট একটি বাহিনী নিয়ে। যুদ্ধে সংগীদের প্রায় সবাই শহীদ হন। চারজন সংগী নিয়ে তিনি শত্রুদের লাইন ভেদ করে বেরিয়ে পড়েন। শত্রুদের এড়িয়ে নিকটবর্তী খালে একটি আহত পা নিয়ে কাটান ৩৩ ঘন্টা। অবশেষে তিনি ধরা পড়েন।

একদিন বন্দী শিবিরে আসেন রাশিয়ার প্রধান সেনাপতি নিকোলাস। সব বন্দীরা তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। সাঈদ নূরসী দাঁড়াননি। এজন্য রুশ সামরিক আদালতে তাঁর বিচার হয়। কয়েকজন বন্ধু তাঁকে পরামর্শ দেন ক্ষমা প্রার্থনা করতে। তিনি বলেন, "হয়তো তাদের মৃত্যু দণ্ডাদেশ হবে অনন্ত জগতে ভ্রমণের জন্য আমার পাসপোর্ট।" বিচারে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। গুলীর সম্মুখীন হবার আগে তিনি সালাত আদায় করতে চাইলেন। ইতিমধ্যে একজন সামরিক অফিসার এসে জানান যে, মৃত্যুদণ্ড বাতিল করা হয়েছে। তাঁকে পাঠানো হয় সাইবেরিয়া। সেখানে বন্দী

শিবিরে তিনি কাটান আড়াই বছর। সেখান থেকে তিনি পালাতে সক্ষম হন। হিজরী ১৩৩৪ সাল/ঈসায়ী ১৯৪৮ সালে তিনি পৌঁছেন ইস্তাম্বুল। তিনি সাদরে গৃহীত হন সেখানে। তাঁকে দারুল হিকমত আল ইসলামীয়ার একজন সদস্য নিযুক্ত করা হয়।

কিছুকালের মধ্যে তাঁর ১২টি বই আত্মপ্রকাশ করে। বই থেকে অর্জিত আয়ের অতি সামান্য অংশ তিনি নিজের জন্য গ্রহণ করতেন। বাকী অংশ বিলিয়ে দিতেন আন্দোলনী কাজে।

স্বৈরাচারের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি ইসলামের গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য লিখেন "খাতাওয়াত-ই-সিত্তা"। এ বই লেখার কারণে তাঁর ডাক পড়ে আংকারায়। আংকারাতে এসে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের ইসলামদ্রোহী মনোভাব দেখে তিনি ব্যথিত হন। ফিরে এসে তিনি প্রশাসকবৃন্দ পার্লামেন্টের সদস্য এবং সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখেন। তিনি তাঁদেরকে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার পরামর্শ দেন। জানা যায় ৬০ জন পদস্থ ব্যক্তি তাঁর চিঠিতে প্রভাবিত হয়ে সালাত আদায়ে পাবন্দ হন। কিন্তু মুস্তফা কামাল পাশা এতে নূরসীর ওপর নারাজ হন। সালাতের প্রশ্নে মুস্তফা কামাল এবং নূরসীর মধ্যে ঘটে বাদানুবাদ।

পূর্ব আনাতোলিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তাটি নূরসীকে আবার পেয়ে বসে। এ বিষয় নিয়ে তিনি সরকারের সাথে আলোচনা চালান। সরকার অর্থ বরাদ্দ করতে সম্মত হন। আনাতোলিয়ার মুসলিমগণ ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ। তাঁদেরকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করাতে পারলে তাঁরা ইসলামের জন্য বড় রকমের অবদান রাখতে পারবেন—এ চিন্তা নিয়েই নূরসী এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

মুস্তফা কামাল পাশা নূরসীর প্রভাব প্রতিপত্তিতে ভীত ছিলেন। তিনি নূরসীকে বিভিন্ন পদে বসাতে চাইলেন। নূরসী সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর কাছে ইসলামী আন্দোলনের চেয়ে অধিকতর প্রিয় আর কিছু ছিল না।

নূরসী ভান প্রদেশে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন পাহাড়ের এক গুহায়। সেখানে তিনি ইবাদাত করতেন, ধ্যান করতেন। সাক্ষাতকারীদেরকে দিতেন তা'লীম।

এ সময়ে সরকারবিরোধী স্বার্থান্ধ কিছুলোক এসে তাঁকে জানালো যে, জনগণের ওপর তাঁর প্রভাব প্রভূত, কাজেই তাঁর উচিত সরকার বিরোধী বিদ্রোহে তাদেরকে সাহায্য করা। তিনি তাদেরকে পরামর্শ দেন জাতিকে সুশিক্ষিত করা এবং সঠিক পথে পরিচালনা করার উদ্যোগ নিতে।

নূরসীর অবস্থানের ওপর সরকারী নজর ছিলো। গুহার এ সিংহটি কোনো এক সময় গর্জন করে উঠতে পারেন, এ ছিল তাঁদের আশংকা। তাঁকে সে পাহাড়ে বেশীদিন থাকতে দেয়া হয়নি। বুরদুর নামক স্থানে নির্বাসিত হন তিনি। সেখান থেকে নির্বাসিত হন ইসপার্টাতে। সেখানে অবস্থানকালেও তিনি ইসলামী আন্দোলনের কাজ চালাতে থাকেন। সরকার স্বস্তি পেলো না। এবার তাঁকে নির্বাসিত করা হয় বারলার পাহাড়ী অঞ্চলে। বারলাতে কাটে তাঁর সংগ্রামী জীবনের মূল্যবান আটটি বছর। এখানে থাকাকালে তাঁর কলম চলে দুর্বার গতিতে। রচিত হয় একশোটি ছোট্ট বই। এগুলোরই নাম "রিসালা-ই-নূর"। এগুলো পড়ে যারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিবেদন করেন তাঁরাই "তালাবা-আন-নূর"। "রিসালা-ই-নূর" সাঈদ নূরসীর ইসলামী চিন্তা ও জ্ঞানের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। তালাবা আন-নূরের মাধ্যমে এগুলো ছড়িয়ে পড়ে দেশের আনাচে কানাচে। পৌঁছে দেশের বাইরেও। মুজাদ্দিদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব-মুসলিম সমাজে।

আট বছর পর বারলা থেকে তিনি আসেন ইসপার্টা। ইসপার্টা পরিণত হয় ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে। কিন্তু আবার ঘনিয়ে আসে বিপদ। ১২০ জন তালাবা-আন-নূরসহ তিনি বন্দী হন। এটি ছিলো ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের ঘটনা। ফৌজদারী কোর্টে তাঁর বিচার শুরু হয়। তিনি এক বছরের এবং তাঁর ১৫জন সংগী ছ'মাসের কারাদণ্ড লাভ করেন। এক বছর জেলখানায় থাকার পর তিনি ছাড়া পান। কিন্তু অবিলম্বে নির্বাসিত হন কাসতামোনুতে। আবার আটটি বছর তাঁকে কাটাতে হয় এখানে। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে থাকেন। কাসতামোনুতে অবস্থানকালে তাঁর কলম নতুন গতি পায়। আবার রচিত হয় বহু পুস্তিকা। আন্দোলনের কর্মীগণ সেগুলো পড়তেন। পড়াতেন অন্যদেরকে। নিজের হাতে কপি তৈরী করে হস্তান্তরিত করতেন অন্যের কাছে। এভাবে ইসলামের জ্যোতি অতি নীরবে পৌঁছতে থাকে ঘুমন্ত তুর্কদের ঘরে ঘরে।

১৯৪৪ সালে ফৌজদারী কোর্টে তাঁর এবং তাঁর সত্তর জন সহকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। শাসকগণ রিসালা-ই নূরের

জনপ্রিয়তা দেখে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। নূরসীর তৎপরতা খতম করে দিতে চাইলেন তারা।

কিন্তু বিচারে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। তিনি মুক্তি পান। বাজেয়াপ্তকৃত বইগুলো ফিরিয়ে দেয়া হয়। এ সময়ে নূরসী দশ মাস জেলে অবস্থান করেছিলেন।

নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরও তাঁর দুর্ভোগ ঘুচেনি। তিনি আবার নির্বাসিত হন। এবার তাঁকে পাঠানো হয় আমিরদাগ। নূরসীর বই ছাপানো যাবে না বলে নির্দেশ পেলো প্রেসগুলো। হাতে কপি করে নূরসীর বইগুলোর সংখ্যা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ করতে থাকে তালাবা-আন-নূর। এ সময়ে মক্কা ও মদীনাতে তাঁর কিছু বই ছাপা হয়। এতো সব কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও আংকারা এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ রিসালা-ই-নূর পড়ে সুপ্তি থেকে জাগতে শুরু করে।

একদিকে সাঈদ নূরসীর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছিলো দেশের বহু মানুষ। অপরদিকে নূরসীর ওপর চলতে থাকে নিপীড়ন। আল্লাহর সৈনিক ছবর অবলম্বন করেন।

১৯৪৮ সালে ৬০ জন সহকর্মী নিয়ে তিনি আবার বন্দী হন। ফৌজদারী কোর্টে আবার মামলা ওঠে। এবার তাঁর জেল হয় দু'বছরের জন্য। ত্রিশ জন ছাত্র-কর্মী লাভ করে ৬ মাসের বন্দী জীবনের সাজা। উচ্চতর আদালতের রায় অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর তিনি জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসেন।

১৯৫০ খৃস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টি বিজয়ী হয়। সরকার তাঁর বই পুস্তকগুলো পর্যালোচনা করে এ ঘোষণা দেন যে, এগুলো ইসলামী নীতিমালার সাথে সংগতিহীন নয়। এরপর তাঁর এবং তাঁর বইগুলোর উপর সরকারী কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল হয়।

কিন্তু ১৯৫২ খৃস্টাব্দে আবার তাঁর বিরুদ্ধে কোর্টে আনা হয় অভিযোগ। "তরুণদের জন্য পথ নির্দেশ" নামক পুস্তিকায় সরকার বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের গন্ধ পান। বিচারক তাঁকে খালাস দিলেন। এ সময়ে অন্যান্য প্রদেশে তালাবা-আন-নূর ব্যাপকহারে বন্দী হন। শেষ পর্যন্ত ছাড়া পান সবাই।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে কিছু সংখ্যক তালাবা-আন-নূরকে গ্রেফতার করা হয়। দু'মাস পর তাঁরা মুক্তিলাভ করেন।

৩৫টি বছর ধরে সাঈদ নূরসী ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত থাকেন। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা অতি ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে দেশের আনাচে-কানাচে বিকাশ লাভ করতে থাকে।

আজকাল নওজোয়ান তুর্কগণ ইসলাম সম্বন্ধে জানতে উৎসাহী। তাঁদের একাংশ আজ ইসলামী বিপ্লব সাধনের সংকল্পে বলীয়ান। ইসলামের আওয়াজ আজ উত্থিত হচ্ছে তুরস্কের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। এ জাগরণের পেছনে বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসীর অবদান অনেক বড়।

ইন্তেকাল

হিজরী ১২৭৯ (১৯৬০) সালের ১২ রমজান বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসী অসুস্থ হয়ে পড়েন। দু'জন সংগীসহ তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে উরফা এসে পৌছেন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি মাঝে-মধ্যে বলতেন ঃ "উদ্বিগ্ন হয়ো না। রিসালা-ই-নূর সব রকমের নাস্তিকতাবাদকে উলোট পালট করে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা করতে থাকবে।"

উরফা-তে ১৯৬০ সালের ২৩ মার্চ (২৭ রমজান) তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহর পথের অক্লান্ত সৈনিক অবশেষে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। সংবাদপত্র ও রেডিওর মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়। উরফার পথে দেখা যায় অসংখ্য জনতার নীরব মিছিল। দলে দলে তালাবা-আন-নূর এসে পৌছে উরফাতে। প্রিয় নেতাকে সমাধিস্থ করে নেতার আরদ্ধ মিশনের পরিসমাপ্তির শপথ নিয়ে তাঁরা আবার ছড়িয়ে পড়েন তুরস্কের শহর-বন্দর-গ্রামে।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

আমাদের প্রকাশিত শিশু সাহিত্য সমূহ।

খাদিজাতুল কোবরা –মায়েল খায়রাবাদী
হযরত ফাতিমা যোহরা –কাজী আবুল হোসেন
দোয়েল পাখির গান –জাকির আবু জাফর
আকাশের ওপারে আকাশ –জাকির আবু জাফর
ফুলে ফুলে দুলে দুলে –জাকির আবু জাফর
দুষ্ট ছেলে –জাকির আবু জাফর
এক রাখালের গল্প –জাকির আবু জাফর
মর্দে মুজাহিদ যুগে যুগে –বদরে আলম
হারানো মুক্তার হার –বদরে আলম
চরিত্র মাধুর্য –বদরে আলম
তিনশ বছর ঘুমিয়ে –বদরে আলম
হুল –বদরে আলম
কুচোচিংড়ির কৃতজ্ঞতা –ব[illegible]
পড়তে পড়তে অনেক জানা –আবদুল মান্নান তালিব
মা আমার মা –আবদুল মান্নান তালিব
কচিকাঁচার ছড়া –আবদুল মান্নান তালিব
কে রাজা –আবদুল মান্নান তালিব
মানুষ এলো কোথায় থেকে –আবদুল মান্নান তালিব
পরী রাজ্যের রাজকন্যা –শফীউদ্দীন সরদার
রাজার ছেলে কবিরাজ –শফীউদ্দীন সরদার
ভূতের মেয়ে লীলাবতী –শফীউদ্দীন সরদার
ভিনগ্রহের বন্ধু –আসাদ বিন হাফিজ